অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

www.sar

দৈনিক সমকাল, ২০২০-০৯-১০, পৃ- ০৪,

East West University LIBRARY

করোনা, আত্মহত্যা ও সামাজিক সংকট

দিবস | ড. আনিসুর রহমান খান

শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবসে এ বছরের প্রতিপাদ্য- আত্মহত্যা প্রতিরোধে সম্মিলিত প্রচেষ্টা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় ৮ লাখ মানুষ আত্মহত্যা করে। আর আত্মহত্যার চেষ্টা চালায় প্রায় ২০ লাখ মানুষ। বাংলাদেশের গবেষকরা অনুমান করেন, দেশে প্রায় ১০ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করে। যদিও দেশে আত্মহত্যার তথ্য সংগ্রহে কেন্দ্রীয় মনিটরিং ব্যবস্থা নেই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে আমরা এখনও আত্মহত্যাকে জাতীয়ভাবে অগ্রাধিকার দিতে পারিনি। বাংলাদেশে আত্মহত্যা প্রতিরোধের চেষ্টা অনেকাংশে দিবস পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ বছর বিশ্ব আত্মহত্যা দিবসটি পালিত হচ্ছে এমন একটি সময়ে, যখন সারাবিশ্ব কভিড-১৯ মহামারিতে বিপর্যস্ত। এ দুর্যোগের শুরু থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আত্মহত্যা প্রতিরোধমূলক সংস্থা ও গবেষকরা আত্মহত্যা বেড়ে যেতে পারে বলে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মহামারি ও আত্মহত্যার একটি যোগসূত্র রয়েছে। এ বিষয়ে বিখ্যাত ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুরখেইম ১৮৯৭ সালে 'আত্মহত্যা' গ্রন্থে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখিয়েছিলেন, সমাজে যখন নৈরাজ্য বিরাজ করে তখন আত্মহত্যা বেড়ে যায়। কভিড-১৯ একটি জটিল প্রকৃতির নৈরাজ্যমূলক অবস্থা, যার প্রভাব শুধু আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্যের ওপরেই পড়েনি, বরং সামাজিক, মানসিক এবং আর্থিক স্বাস্থ্যকেও আঘাত করেছে। 'কভিড-১৯ এবং আত্মহত্যা' সম্পর্কিত বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট ও গবেষকদের বিশ্লেষণ মূল্যায়ন পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কভিড-১৯-এর প্রভাবে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

আমার মতে, এ সংকটকালে পুরুষদের আত্মহত্যা প্রবণতা নারীর তুলনায় প্রায় ৯ গুণ। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, সারাবিশ্বেই বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে (বাংলাদেশ, চীনসহ কিছু দেশ ব্যতিরেকে) নারীর তুলনায় পুরুষের আত্মহত্যা প্রায় তিন গুণ। অনুমান করা হয়, বিশ্বে প্রতি ১ মিনিটে একজন পুরুষ আত্মহত্যা করে। অন্যদিকে পুরুষের তুলনায় নারীরা অধিক পরিমাণে আত্মহত্যার চেষ্টা করে, যদিও এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার কম। গবেষকরা এ অবস্থাকে জেন্ডার প্যারাডক্স বলে অভিহিত করেন। সমাজ ও পরিবার আশা করে, পুরুষ হবে আর্থিক চালিকাশক্তি। কিন্তু কভিড-১৯-এর ফলে সৃষ্ট কর্মহীনতা ও আর্থিক অনিশ্চয়তায় অনেক পুরুষ এ চাহিদা পূরণে বা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে পরিবার ও সমাজব্যবস্থা থেকে পুরুষ নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করছে। গবেষকরা অনুমান করছেন, কভিড-১৯-এর প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হলে বছরে ২ থেকে ১০ হাজারের মতো অতিরিক্ত আত্মহত্যা ঘটতে থাকবে। যদি এমনটা ঘটে, তা অধিক হারে ঘটবে পুরুষদের ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশে আমরা আত্মহত্যাকে এখনও মানসিক/ব্যক্তিগত সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। আত্মহত্যা যে একটি সামাজিক সমস্যা হতে পারে, তা আমরা অনুধাবন করার চেষ্টা করি না। বাংলাদেশে এনজিও বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো আত্মহত্যা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণে তেমন আগ্রহী নয় বলে মনে হয়। সম্ভবত এটি তাদের কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয় না। প্রতিরোধ ব্যবস্থা যখন সামাজিকভাবে করার চেষ্টা হবে, তখন তা অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

> সমাজে আত্মহত্যাকে একটি 'ট্যাবু' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরিবারের সদস্যরা আত্মহত্যা নিয়ে তেমন কোনো আলোচনায় আগ্রহী হন না। অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যা সংঘটিত হয়েছে এমন পরিবারের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক করতে (যেমন বিয়ে) অন্যরা আগ্রহী হন না। এ সামাজিক শিকল ভাঙতে হবে। আর এটা তখনই সম্ভব যখন আত্মহত্যাকে সমাজের অন্যান্য সমস্যার মতো এক কাতারে দেখা যাবে

এ ক্ষেত্রে নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একসময় পারিবারিক সহিংসতাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত সমস্যা হিসেবে দেখা হতো। ব্যাপক সামাজিক প্রচারণা এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে পারিবারিক সহিংসতাকে এখন সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সামাজিকভাবেই এ সমস্যাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে আত্মহত্যা প্রতিরোধে প্রয়োজন একটি সমন্বিত নীতি, যেখানে আত্মহত্যাকে সামাজিক-মানসিক এবং অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। বাংলাদেশের মতো দেশে একজন উপার্জনক্ষম মানুষের মৃত্যু একটি পরিবারকে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে। আমাদের অর্থনীতিবিদরা কি কখনও ভেবে দেখেছেন, বছরে ১০ হাজার মানুষের মৃত্যুর সমানুপাতিক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কতটুকু? অন্যদিকে আমাদের সমাজবিজ্ঞানীরা কি কখনও ভেবে দেখেছেন, ১০ হাজার মানুষের মৃত্যু পরিবার ও সমাজ-কাঠামোতে কী ব্যাপক পরিমাণ নৈরাজ্যের সৃষ্টি করছে? সমাজে আত্মহত্যাকে একটি 'ট্যাবু' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরিবারের সদস্যরা আত্মহত্যা নিয়ে তেমন কোনো আলোচনায় আগ্রহী হন না। অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যা সংঘটিত হয়েছে এমন পরিবারের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক করতে (যেমন বিয়ে) অন্যরা আগ্রহী হন না। এ সামাজিক শিকল ভাঙতে হবে। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন আত্মহত্যাকে সমাজের অন্যান্য সমস্যার মতো এক কাতারে দেখা যাবে।

এ সময়ের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী হিসেবে পুরুষের আত্মহত্যা প্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে হবে। কভিড-১৯ নিয়ে যে ব্যাপক জনসচেতনতা কার্যক্রম চলমান, তার সঙ্গে আত্মহত্যা প্রতিরোধকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং টেলিফোন নেটওয়ার্ককে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। বিশেষত, পুরুষদের জন্য এ বার্তা দিতে হবে যে, বর্তমান অবস্থাসৃষ্ট আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা ক্ষণস্থায়ী। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় অবশ্যই সম্ভব। উল্লেখ্য, সরকারের সুচিন্তিত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আর্থিক খাত ধীরে ধীরে স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে আসছে। আশা করা যায়, পুরুষরা কর্ম ও উপার্জনক্ষম অবস্থায় ফিরতে পারলে আত্মহত্যার ঝুঁকিও কমে যাবে। পরিবারের সব সদস্যকে অনুধাবন করতে হবে, একজন কর্মহীন বা উপার্জনহীন পুরুষ কোনোভাবে পরিবারের বোঝা নয়; সে সামাজিক নৈরাজ্যমূলক অবস্থার শিকার মাত্র। পরিবার প্রতিপালনে পুরুষের যেমন দায়িত্ব রয়েছে, আজকের এ লিঙ্গ সমতার যুগে নারীও এ দায়িত্ব এড়াতে পারে না।